সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য নিরসন ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নে কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে স্থূল দেশজ উৎপাদ বা জিডিপিতে কৃষির বিভিন্ন উপখাতের (ফসল, পশুসম্পদ, বন ও মৎস্য) সমন্বিত অবদান শতকরা প্রায় ২১.৯১ ভাগ। এতে মৎস্য খাতের অবদান শতকরা প্রায় ৫.০৩ ভাগ (সারণি ৭.২)। এককভাবে ফসল উপখাতের অবদান জিডিপি'র শতকরা প্রায় ১২.১০ ভাগ। দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৫১.৭ ভাগ কৃষিখাতে নিয়োজিত (বিবিএস লেবার ফোর্স সার্ভে, ২০০২-২০০৩)। দেশের মোট রপ্তানিতে কৃষিজাত পণ্যের (কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চা সহ) অবদান শতকরা ৪.৯৫ ভাগ[১] (২০০৪-০৫)। মূল্য সংযোজনের গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান ব্যাপক।

বক্স নং ৭.১: জাতীয় কৃষি নীতি ১৯৯৯ এর প্রধান উদ্দেশ্যাবলীঃ

- লাভজনক ও টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং কৃষকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি;
- ভূমির উৎপাদনশীলতা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন;
- কোন একটি ফসলের উপর অতিশয় নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনে ঝুঁকি হ্রাস;
- খাদ্য নিরাপত্তা বিধান ও পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি;
- বিভিন্ন ফসলের বিরাজমান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
- জৈবপ্রযুক্তির (Biotechnology) প্রবর্তন, ব্যবহার ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ;
- শিল্পখাতের জন্যে সহায়ক ফসল ও অন্যান্য কৃষি পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ;
- কৃষি পণ্যের আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি বৃদ্ধির নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি;
- কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিনির্ভর নতুন শিল্প স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি;
- প্রান্তিক,ক্ষুদ্র ও বর্গা চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization - WTO) এর কৃষি চুক্তি, SAFTA ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির আলোকে জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে কৃষি ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলা।

উৎস: কৃষি মন্ত্রণালয়।

২০০৩-০৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.২৭ শতাংশ। কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৩৮ শতাংশ (ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬=১০০)। এর মধ্যে শস্য উপখাতে প্রবৃদ্ধি ৪.২৭ শতাংশ, পশুসম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার ৪.৯৮ শতাংশ ও বনসম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধি ৪.১৮ শতাংশ। উক্ত অর্থবছরে মৎস্যখাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.০৯ শতাংশ। প্রাক্কলিত সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরে (২০০৪-০৫) কৃষি ও মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে যথাক্রমে -০.৭৩ শতাংশ ও ৪.০২ শতাংশ। ১৯৯৪-৯৫ থেকে ২০০৪-০৫ পর্যন্ত কৃষি ও মৎস্য খাতদ্বয়ের প্রবৃদ্ধি সারণি ৭.১-এ দেখানো হল।

সারণি ৭.১ঃ কৃষি ও কৃষি উপখাত এবং মৎস্য খাতের প্রবৃদ্ধির হার

(ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬)

(শতকরা)

খাত/উপ-খাত	৯৪-৯৫	৯৫-৯৬	৯৬-৯৭	৯৭-৯৮	৯৮-৯৯	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২	০২-০৩	০৩-০৪	০৪-০৫ (সাময়িক)
জিডিপি প্রবৃদ্ধি	**৪.৯৩**	**৪.৬২**	**৫.৩৯**	**৫.২৩**	**৪.৮৭**	**৫.৯৪**	**৫.২৭**	**৪.৪২**	**৫.২৬**	**৬.২৭**	**৫.৩৮**
১। কৃষি	- ১.৯	২.০	৫.৬	১.৬	৩.২	৬.৯	৫.৫	-০.৬	৩.২৯	৪.৩৮	-০.৭৩
(ক) শস্য	- ৩.৪	১.৭	৬.৪	১.১	৩.১	৮.১	৬.২	-২.৪	২.৮৮	৪.২৭	-৩.৩০
(খ) পশুসম্পদ	২.৫	২.৫	২.৬	২.৬	২.৭	২.৭	২.৮	৪.৭	৪.৫১	৪.৯৮	৭.৮২
(গ) বনসম্পদ	২.৮	৩.৫	৪.০	৪.৫	৫.২	৪.৯	৪.৯	৪.৯	৪.৪৩	৪.১৮	৪.২৫
২। মৎস্যসম্পদ	৬.৮	৭.৪	৭.৬	৯.০	১০.০	৮.৯	-৪.৫	২.২	২.৩৩	৩.০৯	৪.০২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

[১] রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, জুলাই-মার্চ '০৫ পর্যন্ত।

সারণি ৭.২ ঃ জিডিপি-তে কৃষি ও মৎস্য খাতের অবদান

(ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬)

(শতকরা হারে)

খাত/উপখাত	৯৪-৯৫	৯৫-৯৬	৯৬-৯৭	৯৭-৯৮	৯৮-৯৯	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২	০২-০৩	০৩-০৪	০৪-০৫ (সাময়িক)
কৃষি	**২০.৮১**	**২০.৩২**	**২০.৩৯**	**১৯.৬৭**	**১৯.৩৫**	**১৯.৪৯**	**১৯.৫১**	**১৮.৫৮**	**১৮.২২**	**১৭.৯৭**	**১৬.৮৮**
শস্য	১৫.৪৩	১৫.০৩	১৫.২১	১৪.৫৯	১৪.৩৩	১৪.৫৯	১৪.৭০	১৩.৭৫	১৩.৪৩	১৩.২৩	১২.১০
	(৭৪.১৭)	(৭৩.৯৬)	(৭৪.৫৭)	(৭৪.১৫)	(৭৪.০৬)	(৭৪.৮৭)	(৭৫.৩৭)	(৭৪.০)	(৭৩.৬৯)	(৭৩.৬২)	(৭১.৬৮)
পশুসম্পদ	৩.৪২	৩.৩৬	৩.২৭	৩.১৯	৩.১২	৩.০২	২.৯৫	২.৯৬	২.৯৩	২.৯১	২.৯৭
	(১৬.৪৫)	(১৬.৫৩)	(১৬.০৬)	(১৬.২২)	(১৬.১৩)	(১৫.৫০)	(১৫.১০)	(১৫.৯)	(১৬.০৯)	(১৬.১৯)	(১৭.৫৯)
বনসম্পদ	১.৯৫	১.৯৩	১.৯১	১.৮৯	১.৯০	১.৮৮	১.৮৭	১.৮৮	১.৮৬	১.৮৩	১.৮৯
	(৯.৩৮)	(৯.৫১)	(৯.৩৭)	(৯.৬৩)	(৯.৮১)	(৯.৬৩)	(৯.৫৩)	(১০.১)	(১০.২২)	(১০.১৮)	(১০.৭২)
মৎস্যসম্পদ	**৫.২১**	**৫.৩৬**	**৫.৪৮**	**৫.৬৭**	**৫.৯৩**	**৬.০৯**	**৫.৫১**	**৫.৪০**	**৫.২৫**	**৫.১১**	**৫.০৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

নোটঃ বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা কৃষি খাতে উপখাতসমূহের অবদান নির্দেশ করে।

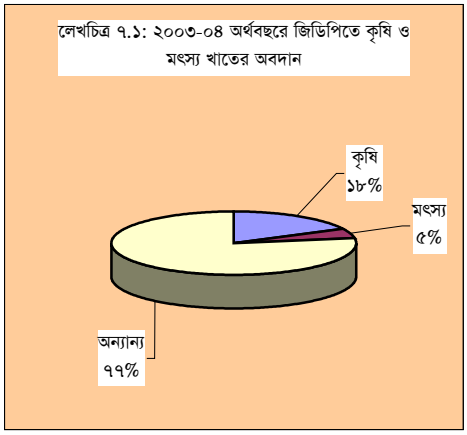

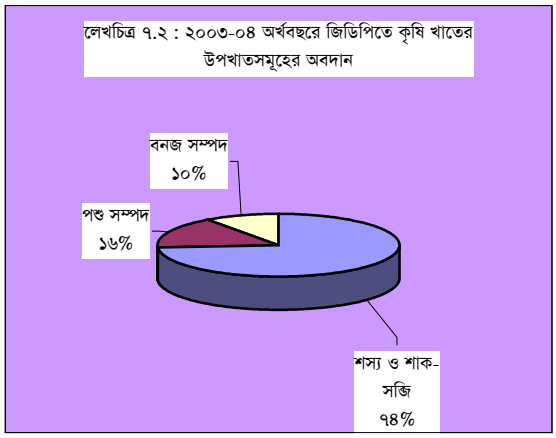

খাদ্যশস্য উৎপাদন

২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে চূড়ান্ত হিসাব মোতাবেক খাদ্যশস্যের উৎপাদন দাঁড়ায় ২৭৪.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আউশ ১৮.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১১৫.২১ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১২৮.৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১২.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন (সারণি-৭.৩)।

চলতি ২০০৪-০৫ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩০০.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আউশ ২০.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১২৭.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৩৭.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন, ও গম ১৪.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন। আউশ ও আমনের মৌসুম ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। চূড়ান্ত হিসাব মোতাবেক আউশের উৎপাদন হয়েছে ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং আমন ফসলের উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৯৮.২০ লক্ষ মেট্রিক টন। গত বছরের সৃষ্ট বন্যায় আউশ ও আমন ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় এ বছর এ ফসল দু'টি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। এ বছর গমের ফসল ১৩.০০ লক্ষ মেট্রিক টন হবে বলে আশা করা যায়। বোরো ফসলের উৎপাদন এ বছর বৃদ্ধি পাওয়ায় মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন দাঁড়াবে প্রায় ২৬৩.২০ লক্ষ মেট্রিক টন (সারণি-৭.৩)।

সারণি ৭.৩ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

(১৯৯৪-৯৫ থেকে ২০০৪-০৫ পর্যন্ত)

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্য শস্য	৯৪-৯৫	৯৫-৯৬	৯৬-৯৭	৯৭-৯৮	৯৮-৯৯	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২	০২-০৩	০৩-০৪	০৪-০৫ (প্রাক্কল)
আউশ	১৭.৯	১৬.৮	১৮.৭১	১৮.৭৫	১৬.১৭	১৭.৩৪	১৯.১৬	১৮.০৮	১৮.৫১	**১৮.৩২**	**১৫.০০***
আমন	৮৫.০	৮৭.৯	৯৫.৫২	৮৮.৫০	৭৭.৩৬	১০৩.০৬	১১২.৫০	১০৭.২৬	১১১.১৫	**১১৫.২১**	**৯৮.২০***
বোরো	৬৫.৪	৭২.২	৭৪.৬০	৮১.৩৭	১০৫.৫২	১১০.২৭	১১৯.২১	১২৭.৬৬	১২২.২২	**১২৮.৩৭**	**১৩৭.০০**
মোট চা'ল	**১৬৮.৩**	**১৭৬.৯**	**১৮৮.৮৩**	**১৮৮.৬২**	**১৯৯.০৫**	**২৩০.৬৭**	**২৫০.৮৭**	**২৪৩.০০**	**২৫১.৮৮**	**২৬১.৯০**	**২৫০.২০**
গম	১২.৫	১৩.৭	১৪.৫৪	১৮.০২	১৯.০৮	১৮.৪০	১৬.৭০	১৬.০৬	১৫.০৭	**১২.৫৩**	**১৩.০০**
ভূট্টা	-	-	-	-	-	-	১.৪৯	১.৫২	১.৭৫	**২.৪১**	**৩.০০**
মোট (ভুট্টাসহ)	**১৮০.৮**	**১৯০.৬**	**২০৩.৩৭**	**২০৬.৬৪**	**২১৮.১৩**	**২৪৯.০৭**	**২৬৯.০৬**	**২৬০.৫৮**	**২৬৮.৭০**	**২৭৬.৪৩**	**২৬৬.২০**
মোট (ভুট্টাবাদে)	**১৮০.৮**	**১৯০.৬**	**২০৩.৩৭**	**২০৬.৬৪**	**২১৮.১৩**	**২৪৯.০৭**	**২৬৭.৫৭**	**২৫৯.০৬**	**২৬৬.৯৫**	**২৭৪.৪৩**	**২৬৩.২০**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

* প্রকৃত উৎপাদন

শস্য নিবিড়তা (Cropping Intensity)

১৯৮১-৮২ সালে বাংলাদেশে মোট ভূমি এলাকা ছিল ১৪.২৯ মিলিয়ন হেক্টর, এর মধ্যে নীট চাষযোগ্য ভূমি ছিল ৯.৩৮ মিলিয়ন হেক্টর যা মোট ভূমি এলাকার মধ্যে মাত্র ৬৫.৬৩ শতাংশ। এ সময়ে শস্য নিবিড়তা ছিল ১৫৩.৮৪। ১৯৯২-৯৩ সালে দেশের মোট ভূমি এলাকা কিছু বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.৮৪ মিলিয়ন হেক্টরে দাঁড়ায় কিন্তু নীট চাষযোগ্য ভূমি হ্রাস পেয়ে ৮.৭৫ মিলিয়ন হেক্টরে পৌঁছে যা মোট ভূমি এলাকার মাত্র ৫৮.৯৬ শতাংশ। তবে এ সময়ে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭৪.৩৫। ২০০১-০২ সালে দেশের মোট ভূমি এলাকা ছিল ১৪.৮৪ মিলিয়ন হেক্টর এবং নীট চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ ছিল ৮.৪০ মিলিয়ন হেক্টর যা মোট ভূমির মাত্র ৫৭.১৪ শতাংশ। তবে শস্য নিবিড়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১-০২ সালে দাঁড়ায় ১৭৬.৯৮।

সারণি ৭.৪: বাংলাদেশে শস্য নিবিড়তার প্রবণতা

(১৯৮১-৮২ থেকে ২০০১-০২ পর্যন্ত)

(এলাকা মিলিয়ন হেক্টরে)

বৎসর	দেশের মোট ভূমি এলাকা	নীট চাষযোগ্য ভূমি	মোট এলাকার মধ্যে নীট চাষযোগ্য ভূমির শতকরা হার	নীট এলাকা দেখানো হল	মোট ফসলি এলাকা	শস্য নিবিড়তা
১৯৮১-৮২	১৪.২৯	৯.৩৮	৬৫.৬৩	৮.৫৮	১৩.২০	১৫৩.৮৪
১৯৮২-৮৩	১৪.২৯	৯.৩৬	৬৫.৬৩	৮.৬৫	১৩.০০	১৫০.৩৫
১৯৮৩-৮৪	১৪.৪৫	৯.৪৬	৬৫.৪১	৮.৬৮	১৩.৩৬	১৫৩.৯৬
১৯৮৪-৮৫	১৪.৪৮	৯.৪৩	৬৫.১০	৮.৬৪	১৩.১৫	১৫২.২২
১৯৮৫-৮৬	১৪.৪৮	৯.৪৪	৬৫.১৯	৮.৭৫	১৩.৫৪	১৫৪.৪৮
১৯৮৬-৮৭	১৪.৭০	৯.৫১	৬৪.৬৮	৮.৮৫	১৩.৩৪	১৫০.৭৩
১৯৮৭-৮৮	১৪.৮৪	৯.৮২	৬৬.২২	৮.২৯	১৩.৮২	১৬৬.৭৫
১৯৮৮-৮৯	১৪.৮৪	৯.৮৪	৬৬.৩৩	৮.১৫	১৩.৭১	১৬৮.১৯
১৯৮৯-৯০	১৪.৮৪	৯.৭৮	৬৫.৯৫	৮.৩৫	১৪.০৬	১৬৮.৪৪
১৯৯০-৯১	১৪.৮৪	৯.৭২	৬৫.৫০	৮.১৭	১৪.০৩	১৭১.৭০
১৯৯১-৯২	১৪.৮৪	৯.০৯	৬১.২৫	৭.৯৮	১৩.৮১	১৭৩.০২
১৯৯২-৯৩	১৪.৮৪	৮.৭৫	৫৮.৯৬	৭.৮৫	১৩.৭০	১৭৪.৩৫
১৯৯৩-৯৪	১৪.৮৪	৮.৭৫	৫২.০২	৭.৭২	১৩.৪৮	১৭৪.৫২
১৯৯৪-৯৫	১৪.৮৪	৮.৭৭	৫৯.১০	৭.৭৪	১৩.৫২	১৭৪.৬৪
১৯৯৫-৯৬	১৪.৮৪	৮.৭২	৫৮.৭৬	৭.৮০	১৩.৫১	১৭৩.১৮
১৯৯৬-৯৭	১৪.৮৫	৮.২৪	৫৫.৪৯	৭.৮৫	১৩.৮০	১৭৫.৭১
১৯৯৭-৯৮	১৪.৮৫	৮.৩৬	৫৬.৩০	৭.৯৭	১৪.০৯	১৭৬.৭৯
১৯৯৮-৯৯	১৪.৮৫	৮.৪৩	৫৬.৭৭	৭.৯৯	১৩.৯৬	১৭৪.৭৩
১৯৯৯-০০	১৪.৮৫	৮.৪৫	৫৬.৯০	৮.১৩	১৪.২৭	১৭৫.৫২
২০০০-০১	১৪.৮৫	৮.৪০	৫৬.৫৭	৮.০৮	১৪.৩০	১৭৭.০০
২০০১-০২	১৪.৮৪	৮.৪৮	৫৭.১৪	৮.০৮	১৪.৩০	১৭৬.৯৮

উৎস: বিবিএস; সেক্টর মনিটরিং ইউনিট, কৃষি মন্ত্রণালয় জুলাই, ২০০৪

লেখচিত্র ৭.৩: বাংলাদেশে শস্য নিবিড়তার ধারা

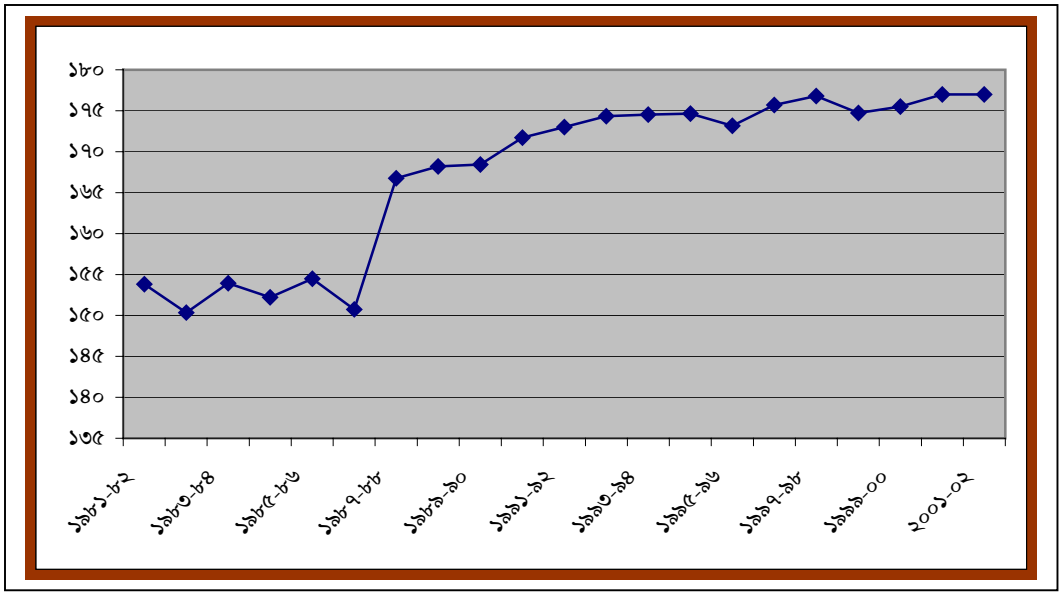

লেখচিত্র ৭.৪: ২০০১-০২ সালের তথ্যের ভিত্তিতে নীট ফসল বিভাজন এলাকা
(নীট এলাকা দেখানো হল = ৮.০৮ মিলিয়ন হেক্টর)

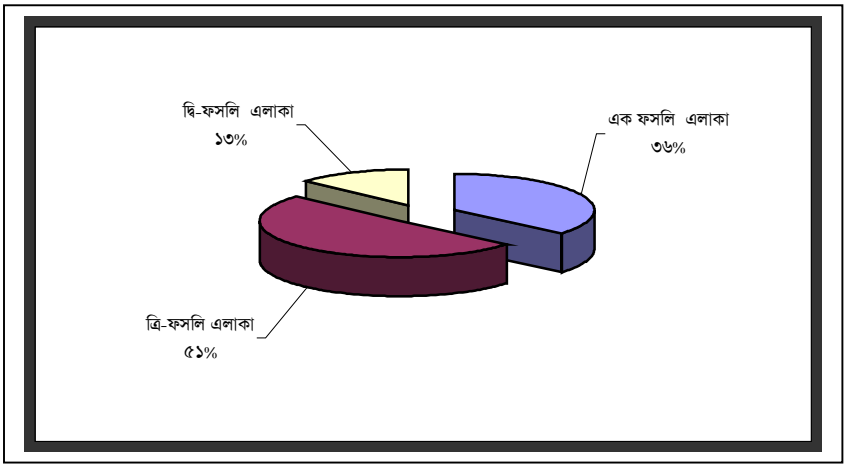

বন্যায় খাদ্য-শস্যের ক্ষয়ক্ষতিঃ

বন্যা প্রতি বছরই ফসলের ক্ষয়ক্ষতির একটি নিয়মিত কারণ। গত ২০০১ সালে সংঘটিত বন্যায় দেশের ১৬টি জেলায় ১৩১ টি উপজেলার মধ্যে ৭৯ টি উপজেলার ০.৪১৮ লক্ষ হেক্টর জমির ০.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন ফসল বিনষ্ট হয়। এর মধ্যে ০.৫৮ মেট্রিক টন চাল। ২০০২ সালের বন্যায় দেশের ৪৫টি জেলায় ২০৮ টি উপজেলায় ৩.৮৫ লক্ষ হেক্টর জমির ৮.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন ফসল বিনষ্ট হয়। এর মধ্যে ৫.০৮ মেট্রিক টন চাল। ২০০৩ সালে সংঘটিত বন্যায় দেশের ৪৭ টি জেলায় ২৬৬ টি উপজেলায় ২.৪৫ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল বিনষ্ট হয়, এর মধ্যে ২.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন চাল (সারণি-৭.৫)। ২০০৪ সালের আগাম বন্যায় (early flash flood) সিলেটের হাওর অঞ্চলে ব্যাপক পরিমাণ বোরো ফসলের ক্ষতি হয়েছে। এ ছাড়া জুলাই-সেপ্টেম্বর'০৪ মাসের বন্যায় দেশের ৫৬টি জেলার ১৪.১২ হেক্টর জমির ফসল বিনষ্ট হয়। এর মধ্যে ২০.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন চাল রয়েছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তা করার লক্ষে সরকার বন্যা-পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

২০০৪ সালে প্রলয়ঙ্করী বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য কৃষিখাতের জন্য সরকার ব্যাপক পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ফসল আবাদে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মোট ১৮৫.৫০ কোটি টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে যা দ্বারা ৩০ লক্ষ ৫৫ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের এক বিঘা পরিমাণ জমিতে বিভিন্ন ফসল আবাদে প্রয়োজনীয় বীজ ও সার সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সারণি -৭.৫ ঃ বন্যায় খাদ্য-শস্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

(২০০২ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত)

(ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমির পরিমাণ লক্ষ হেক্টর, উৎপাদনে ক্ষতির পরিমাণ লক্ষ মেঃ টন, টাকায় ক্ষতির পরিমাণ কোটি টাকা)

	২০০২			২০০৩			২০০৪		
ফসলের নাম	জমির পরিমাণ	উৎপাদনে ক্ষতি	টাকায় ক্ষতি	জমির পরিমাণ	উৎপাদনে ক্ষতি	টাকায় ক্ষতি	জমির পরিমাণ	উৎপাদনে ক্ষতি	টাকায় ক্ষতি
আউশ	০.৪১	০.৬০	৯৬.০৮	০.৭১৭৩১	০.১০৪০২	১৪৫.৬১৬৮	২.৫৯৯৪৭	৩.৯৫১৮৮	৫৫৩.১৭
আউশ বীজতলা	০	০	০	০	০	০	০	০	০
বোনা আমন	০.৬২	০.৬৯	৯৬.০৮	০.৯৯৬৬৬	০.৯৯৬৬৬	১৩৯.৫৪২২	৩.৪১৯৯	৩.৪১৯৯	৫১২.৯৮
রোপা আমন	০.৭৭	০	৭৪.৪৬	০.০৪৩৫১	০.০৯৫৭৪	১৪.০২৪৮	৩.৬৪২৯৭	৭.৬৬১৪৮	১১৪৯.২২
রোপা আমন বীজতলা	০.২১	০	৩৭.০৪	০.০৮৭৯৫	০	১৫.৮৩১০	০.৬০৪১৪	০	৩০.২১
বোরো	১.২৪	৩.৭৯	৫৩০.৪১	০.২৭৭৪৪	১.০৪১৪৪	১৪৫.৮০১৬	১.৭৮৩৮৬	৫.৪৫৮৬৩	৮৭৩.৩৮
বোরো বীজতলা	০	০	০	০.০১৫৫১	০	২.৭৯১৮	০	০	০
মোট ধান (চাল)	**৩.২৫**	**৫.০৮**	**৮২১.৪৩**	**২.১৩৮৩৮**	**২.২৩৭৮৬**	**৪৬৩.৬০৮২**	**১২.০৫০৩৪**	**২০.৪৯১৮**	**৩১১৮.৯৬**
পাট,শাকসব্জি,গাছ-গাছড়া প্রভৃতি	০.৬০	৩.৪৪	৩২৬.৮৬	০.৩০৯৪৬	১.১২৩৯৮	৪৩.৭৫৭৫	২.০৬৯১৭	১৪.৫২৭৪২	১৫৪২.৯৮
সর্বমোট	**৩.৮৫**	**৮.৫২**	**১১৪৮.২৯**	**২.৪৪৭৮৪**	**৩.৩৬১৮৪**	**৫০৭.৩৩৫৭**	**১৪.১১৯৫১**	**৩৫.০১৯৩১**	**৪৬৬১.৯৪**

উৎস ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়।

খাদ্য বাজেট

২০০৪-০৫ অর্থবছরের জন্য জুলাই'০৪ মাসে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩০০.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হয় যা নীট খাদ্যশস্য উৎপাদন হিসেবে দাঁড়ায় ২৭০.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টনে (বীজ, পশুখাদ্য ও অপচয় বাবদ ১০% বাদ দিয়ে)। কিন্তু গত জুলাই -সেপ্টেম্বর'০৪ পর্যন্ত সময়ে অস্বাভাবিক বন্যা ও অতিবৃষ্টি জনিত দুর্যোগের কারণে আউশ ও আমন ফসলের আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত উৎপাদন ৪০ লক্ষ টন মেট্রিক টন কম হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে সরকারি অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৯.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৮.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১৫ হাজার মেট্রিক টন)। চলতি ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। খাদ্য সাহায্য হিসাবে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ২.৮৯ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বেসরকারিভাবে খাদ্য শস্যের আমদানির পরিমাণ ছিল ২৪.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন। চলতি অর্থবছরের ১৬-০৪-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত বেসরকারি খাতে খাদ্যশস্যের আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১০.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১৪.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন)। ১৯৮১-৮২ হতে ২০০৪-০৫ পর্যন্ত বিদেশ হতে খাদ্যশস্য আমদানির হিসাব পরিশিষ্ট সারণি ২৮ -এ দেখানো হয়েছে।

কৃষি ব্যবস্থাপনা

কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্হান বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এ কারণে কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সার্বিক অর্থনীতির সূচক বৃদ্ধিতে কৃষির এই গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার কৃষিখাতকে সর্বোচচ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। দেশে বর্তমানে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং সেই সাথে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার ও টেকসই করার লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক কৃষি ব্যবস্হার উপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে দেশের সর্বত্র মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের দোরগোড়ায় সারসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ, কৃষি সম্প্রসারণ নীতির বাস্তবায়ন, কৃষিঋণ বিতরণ পদ্ধতি সহজীকরণ, কৃষিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি, কৃষিজাত পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য গবেষণা পদ্ধতির আধুনিকায়ন, গবেষণালদ্ধ সমন্বিত প্রযুক্তি ব্যবহার ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় কৃষি নীতির আলোকে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাতীয় কৃষিনীতিসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ণ করা হয়েছে। **এই কর্ম-পরিকল্পনা জাতীয় কৃষিনীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও কৃষি প্রবৃদ্ধির কাম্য হার দ্রুত অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্হা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে**। সম্প্রসারণ সেবাকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছানো, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, কৃষি পণ্য ব্যবসাকে শক্তিশালী, জনপ্রিয় ও লাভজনক করার কাজে বৈদেশিক সহায়তা গ্রহণ, এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগী কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ এর অন্যতম উদ্দেশ্য । জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্হাকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকরভাবে গড়ে তোলার ব্যবস্হা নেয়া হয়েছে এবং সে সাথে গবেষণা ও সম্প্রসারণের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধির উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হচেছ । এ ছাড়া মৃত্তিকা সম্পদের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় রোধ, সেচের পানির উপযোগিতা নির্ণয়, ভূমির অপব্যবহার ও ফসলের পুষ্টি ঘাটতি রোধকল্পে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমস্যা সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

কৃষকদের সার পরিস্হিতি নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও সময়মত ব্যবস্হা গ্রহণের ফলে দেশে সার সরবরাহ এবং বিতরণের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে। সার বিতরণ পরিস্হিতির উন্নতিকল্পে গৃহীত ব্যবস্হাদির মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে মনিটরিং ব্যবস্হা প্রতিষ্ঠা, ডিলারশীপ ব্যবস্হা উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ, সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য বাফার মজুদ কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্হা জোরদারকরণ, উন্নতমানের সার হিসেবে ডিএপি/ এনপিকেএস সার ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ, রোপা ধানে গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহার ও সম্প্রসারণ, দানাদার ও রং মিশ্রিত এসএসপি সার আমদানি নিষিদ্ধকরণ, পুষ্টিমান সম্পন্ন ফসফেটিক সার আমদানি উৎসাহিত করার জন্য টিএসপি, ডিএপি, এমওপি এবং এনপিকেএস সার আমদানির উপর হতে আগাম আয়কর ও উন্নয়ন সারচার্জ মওকুফের ব্যবস্হা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মাঠ পর্যায়ে সার বিতরণ ব্যবস্থা দক্ষ ও কার্যকর হয়েছে।

মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা গবেষণাগারের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাঠ পর্যায়ে মাটি পরীক্ষার ব্যবস্হা করা হয়েছে। মাটির উর্বরা শক্তি বজায় রাখার জন্য শস্য বহুমুখিকরণ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। কৃষি বাজার ব্যবস্হার উন্নয়ন ও কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে পাইকারি বাজারের উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে। উন্নতমানের বীজ অধিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত, এটি বিবেচনায় রেখে বিএডিসির মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে; এ লক্ষ্যে বিএডিসির বীজ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে জোরদার করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক চাষী পর্যায়ে বীজ নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট, পারমাণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে উচচ ফলনশীল ফসলের জাতসহ বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন করে কৃষি ক্ষেত্র ও খাদ্যশস্য উৎপাদনে দেশকে সমৃদ্ধ করার কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে

যাচেছ। খাদ্যশস্য উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হলেও জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির আরোও সম্ভাবনা রয়েছে। সে সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচেছ।

কৃষিখাতে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিষয়ে অনুসৃত নীতিসমূহ পরীক্ষা করে কৃষির উন্নয়নে সামগ্রিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য গঠিত কৃষি কমিশন তার সুপারিশমালা সম্বলিত প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে পেশ করেছে। মন্ত্রিসভা কমিটির মাধ্যমে এই সুপারিশমালা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং মন্ত্রিসভা কমিটির প্রতিবেদনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়েছে। এফএও এবং ইউএনডিপি'র সহায়তায় কৃষি খাতের ফসল উপখাত সার্বিক পর্যালোচনা করে ''একশনেবল পলিসি ব্রীফ'' (এপিবি) শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন দুটোর যথাযথ বাস্তবায়ন ভবিষ্যতে কৃষির সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কৃষিখাতে ভর্তুকি ও সহায়তা

কৃষি খাতে বিনিয়োগের স্বল্পতা ও কৃষি উপকরণের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষিকে টিকিয়ে রাখার জন্য কৃষিতে ব্যাপক পরিমাণ ভর্তুকি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ২০০৪-০৫ বছরের সংশোধিত বাজেটে ইউরিয়াসহ টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সার ও বিদ্যুৎ এর উপর ভর্তুকি এবং কৃষিখাতে সহায়তার জন্য ১৩১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ৩০% পর্যন্ত নগদ বিকল্প সহায়তা দেয়া হচ্ছে। সুষম সার ব্যবহার উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সারের আমদানি খরচের ওপর ২৫% হারে ভর্তুকি প্রদানের কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ সব উদ্যোগ কৃষি খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেককেই উৎসাহিত করেছে।

সেচ

কৃষি পণ্য উৎপাদনে সেচের পানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। সরকারিভাবে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহ (শক্তিচালিত পাম্প, গভীর নলকুপ, অগভীর নলকূপ, ভাসমান পাম্প ইত্যাদি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করার পর দ্রুত সেচের অধীনে জমির পরিমাণ অর্থাৎ সেচকৃত এলাকা বাড়তে থাকে। অবশ্য সেচযন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে আনুপাতিক হারে সেচকৃত এলাকার পরিমাণ বাড়ছে না। বিভিন্নভাবে সেচের পানির অপচয় হচেছ, ফলে মাঠ পর্যায়ে কৃষি উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য এ মূল্যবান উপকরণটি কার্যকর ও দক্ষভাবে ব্যবহৃত হচেছ না। সঠিকভাবে সেচের পানির ব্যবস্হাপনার মাধ্যমে পানির অপচয় হ্রাসের পাশাপাশি উৎপদন বৃদ্ধি এবং জ্বালানি খরচও হ্রাস করা সম্ভব। এ পরিস্হিতি বিবেচনা করে ফসলনীতির আওতায় সেচ ও খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্হাপনাকে মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূ-গর্ভস্হ ও ভূ-উপরিস্হ পানির সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করে ফসল উৎপাদনে নিবিড়তা, বহুমুখিকরণ ও ফলন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সেচের উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচেছ। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হচেছঃ (১) ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প; (২) শুষ্ক মৌসুমে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধির জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প; (৩) সীতাকুন্ড উপজেলাধীন কুমিরা-সোনাইছড়ি এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ ও নিষ্কাশন ব্যবস্হা উন্নয়ন এবং গুপ্তাখালি জলাধার নির্মাণ ও সেচ প্রকল্প; (৪) সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বরেন্দ্র এলাকা); (৫) বরেন্দ্র এলাকায় গভীর নলকুপ স্হাপন
প্রকল্প; (৬) আশুগঞ্জ পলাশ এগ্রো ইরিগেশান প্রকল্প ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সার্বিকভাবে এ প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য হলো সেচ ব্যবস্হার উন্নয়ন, ভূ-উপরিস্হ পানির যথাযথ ব্যবহার; সমন্বিত এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও খরাপ্রবণ এলাকায় সেচ সুবিধাদি সম্প্রসারণ। উপরন্ত, ক্ষুদ্র সেচ সুবিধার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিএডিসির ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রমকে জোরদার করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

জাতীয় ক্ষুদ্র সেচ শুমারির ফলাফল মোতাবেক গত ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে সেচকৃত জমির পরিমাণ ছিল ৪৫.০৬ লক্ষ হেক্টর (সারণি-৭.৬)। ২০০০-২০০১ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন এলাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫.১৬ লক্ষ হেক্টর, ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ৪৮.০৪ লক্ষ হেক্টর, ২০০২-০৩ অর্থবছরে ৪৮.১৪ লক্ষ হেক্টর, ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৪৮.৩৩ লক্ষ হেক্টর এবং

২০০৪-০৫ অর্থবছরে দাঁড়ায় ৪৮.৫৩ লক্ষ হেক্টর। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে সেচকৃত জমির বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৭.০ শতাংশ।

সারণি-৭.৬ঃ সেচকৃত জমির পরিমাণ

(হেক্টর)

সেচ পদ্ধতি	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-০৫ (প্রাক্কলিত)
ক) ভূ-উপরিস্থ ঃ						
মেজর ইরিগেশন*	৪২২৬৫৬	৩৫২০০০	৪৬৯৫৭৫	৪৮৫০০০	৪৮৭০০	৪৯০০০০
এল এল পি	৬৪৫০৫৩	৬৪৭৩০০	৭৬১৪৩৯	৭৬৪৩০০	৭৬৬১৫৩	৭৭০০০০
দেশীয় পদ্ধতি	২২৪১৭২	২২২০০০	১৮২২৪০	১৭৬২৮০	১৭৫২০০	১৭৫০০০
ক) উপ- মোট	১২৯১৮৮১	১২২১৩০০	১৪১৩২৫৪	১৪২৫৫৮০	১৪২৮৩৫৩	১৪৩৫০০০
খ) ভূ-গর্ভস্থ						
গভীর নলকূপ	৫২২০৬৬	৫২৪৩৩০	৫৮১৫৯৯	৫৮৩৬৯২	৫৮৩৬৯২	৫৮৩৭০০
অগভীর নলকূপ (সারফেস/ডিপ/ভেরি-ডিপ সট)	২৬৪৫৪৭৪	২৬৭৩৯৪৪	২৭৪৭০৯৮	২৭৫৬৫৫৮	২৭৭৬৫৫৭	২৭৯০০০০
অন্যান্য **	৪৬৯০২	৮৬৯০৬	৬২৫১৮	৫৮১২২	৪৪৩৯৭	৪৪০০০
খ) উপ-মোট	৩২১৪৪৪২	৩২৮৫১৮০	৩৩৯১২১৫	৩৩৯৮৩৭২	৩৪০৪৬৪৬	৩৪১৭৭০০
মোট সেচ (ক+খ)	৪৫০৬৩২৩	৪৫০৬৪৮০	৪৮০৪৪৬৯	৪৮২৩৯৫২	৪৮৩২৯৯৯	৪৮৫২৭০০

উৎস ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়

* বাপাউবো এর আওতাধীন প্রাক্কলিত সেচকৃত এলাকা।

** ট্রেডল পাম্প, রোয়াল পাম্প, আর্টিসিয়াল ওয়েল, হস্তচালিত নলকূপ ইত্যাদি আন মেকানাইজড ইউনিটসহ।

সার

কৃষি উৎপাদনে সারের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯২-৯৩ সালে মোট সার ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ২৩.১৬ লক্ষ মেঃ টন, ২০০৩-০৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৩.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টনে। এককভাবে ইউরিয়া সার ১৯৯২-৯৩ সালে ব্যবহার হয় ১৫.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন, ২০০৩-০৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৩.২৪ লক্ষ মে. টনে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯২-৯৩ সালের তুলনায় ২০০৩-০৪ সালে ইউরিয়া ব্যবহার ৪৭ শতাংশ অর্থাৎ ৭.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি হয়েছে। সেচ এলাকা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ইউরিয়া প্রয়োগ সম্প্রসারণের কারণে ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরপক্ষে ফসফেটিক ও পটাস সারের (টিএসপি, ডিএপি, এনপিকেএস ও এসএসপি) ব্যবহার ১৯৯২-৯৩ সালের তুলনায় ২০০৩-০৪ সালে ৬২.৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে সারের ব্যবহার ১৯৯২-৯৩ সালের তুলনায় ৫১.৬৭ শতাংশ বেড়েছে (সারণি - ৭.৭)।

কৃষি মন্ত্রণালয় মার্কেট মনিটরিং এন্ড ইনফরমেশন সিষ্টেম (এমএমআইএস)-এর মাধ্যমে সার্বিক সার পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং পরিবীক্ষণ করছে। জেলা ও মাসওয়ারি চাহিদা মোতাবেক ইউরিয়া সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট জেলা/ উপজেলা কমান্ড এরিয়ার বাইরে পরিবহনের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ আছে, তবে গুটি ইউরিয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা-নিষেধ নেই। জেলা পর্যায়ে গঠিত জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক সরবরাহ, মজুদ, প্রাপ্যতা, মূল্য এবং সার ডিলারের কার্যক্রম মনিটরিং, ডিলারশীপ উপজেলা ভিত্তিককরণ এবং কেন্দ্রীয়ভাবে সার বিতরণ জাতীয় সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলায় সার বিতরণ আরো সুষম, মূল্য পরিস্হিতি কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সীমিত এবং চোরাচালান / কালোবাজারী নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পিক সিজনে যাতে দুষ্প্রাপ্যতার দরুন বা কৃত্রিম কোন সঙ্কট না হয় সে লক্ষ্যে বিসিআইসির মাধ্যমে ইউরিয়া সারের বাফার মজুদ রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ইউরিয়া সারের অপচয় হ্রাস, ৩০-৩৫ শতাংশ সাশ্রয়, ফলন বৃদ্ধি এবং গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকল্পে বেসরকারি খাতে ১৯৯৫-৯৬ সাল হতে প্রবর্তিত গুটি/মেগা গুটি ইউরিয়া সার (সুপার/ মেগা গ্রেনুলস) তৈরি ও বাজারজাতকরণ করা হচেছ। গুটি ইউরিয়া তৈরির মেশিনের সংখ্যা ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ১৩৭০ টিতে (১৩৪৫টি সুপার ও ২৫টি মেগা) পৌঁছেছে। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের আওতাভুক্ত জেলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭ টিতে পৌঁছেছে। ২০০৪-০৫ সালে ৮.৯৫ লক্ষ হেক্টর রোপা ধানের জমিতে (আমন ১৮৫০০০ হেক্টর, বোরো ৭১০০০০ হেক্টর এবং আউশ ৩৭০০০ হেক্টর) গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নার্থে আমন ও বোরো মৌসুমে ১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ধান ছাড়া অন্যান্য রবি শস্যেও গুটি ইউরিয়া ব্যবহার

শুরু হয়েছে। সার ব্যবহার সুষম করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার মিশ্র সারের ব্যবহার উৎসাহিত করা হচেছ। স্হানীয়ভাবে বিসিআইসির চট্টগ্রামস্হ টিএসপি কমপ্লেক্সে পরীক্ষামূলক কিছু এনপিকেএস উৎপাদন হচেছ এবং বেসরকারি খাতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এনপিকেএস উৎপাদন ও বাজারজাত করছে। এনপিকেএস সার বেসরকারি খাতেও আমদানি হচেছ।

এসএসপি সারের পরিবর্তে অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন ডিএপি, টিএসপি, এনপিকেএস ও পটাশ সারের আমদানি বৃদ্ধি ও এ সকল সার ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের প্রচেষ্টা নে'য়া চলছে। সুষম সার ব্যবহার উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৩.৫ লক্ষ মেট্রিক টন টিএসপি, ১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন ডিএপি এবং ২.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন এমওপি সারের আমদানি খরচের ওপর ২৫ শতাংশ হারে ভর্তুকি প্রদানের কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ভেজাল/নকল/নিম্নমানের সার উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণ নিয়ন্ত্রণ করাসহ সারের গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখার জন্য সার (নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ১৯৯৯ অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে। বেসরকারি খাতে আমদানিকৃত সারের ক্ষেত্রে পোষ্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেকশন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। তাছাড়া একটি সার পরিদর্শন ম্যানুয়েল এবং একটি ম্যানুয়েল ফর ফার্টিলাইজার এনালাইসিস প্রণীত হয়েছে।

সারণি -৭.৭ ঃ রাসায়নিক সারের ব্যবহার

' ০০০ ' মেট্রিক টন

ব্যবহৃত সার	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০	০০/০১	০১/০২	০২/০৩	০৩/০৪
ইউরিয়া	১৫৪৭.৪	১৫৭৯.০	১৭৪৮.৫	২০৪৫.৫	২১৪১.০	১৮৬৭.০	১৯০২.০	২১৫১.০	২১২১.০	২২৪৭.৪২	২২৩৯.০	২৩২৪.০৮
টিএসপি	৪০৭.০	২৩৪.২	১২২.৯	১১১.১	৭২.৬	৬২.৪	১৭০.২৫	২৫৯.৩	৩৯৯.৫	৪২৫.৩১	৪০৫.০০	৩৬১.০০
ডিএপি	২.০	২৮.৭	১.৮	০	০	৬.৮	৩৮.৬৩	১০৯.২	৯০.১	১২৭.০৩	১১২.০০	৯০.০০
এমপি	১২৬.১	১০৩.৯	১৫৪.২	১৫৫.৯	২১৯.৩	১৯৩.৫	২১০.৭৫	২৩৯.৫	১২৪.০	২২২.২৬	২৫০.০০	২৪০.০০
এসএসপি	১১৯.৮	১৭০.৬	৫৩৩.৫	৫৯৬.৯	৫২৫.৩	৪৭৩.৩	৩৬২.৩৭	২৩৭.২	১৩৮.৬	১২৭.১৩	১৩০.০০	১৪৮.০০
এনপিকেএস	০	০	০	০	০	০	০	০	১০.২	১২.৮৭	৩০.০০	৪৫.০০
এএস	৫.০	১০.০	২.৫	৮.৭	১১.৭	৯.৭	১২.৪২	২৬.০	১৩.০	২০.১৯	১০.০০	৯.০০
জিংক	০.৭	৫.২	০	১.০	১.২	০.৭	০.৩	১.২	৩.০	০.২৪	২.০০	৭.০০
জিপসাম	১০৮.২	৮৬.১	৭৭.২	১০৩.৬	৮৬.৬	১১৩.৪	১২৮.২২	১৮৯.৪	১০২.৩	৯৬.০৫	১২০.০০	১৪০.০০
অন্যান্য	০	০.১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট	২৩১৬.২	২২১৭.৮	২৬৪০.৬	৩০২২.৭	৩০৫৭.৭	২৭২৬.৮	২৮২৪.৯	৩২১২.৯	৩০১৭.৫	৩২৭৮.৫০	৩২৯৮.০০	৩৩৬৪.০৮

উৎস ঃ এমএমআইএস, কৃষি মন্ত্রণালয়।

কৃষি ঋণ

বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তির অর্ধেকেরও বেশি কৃষিখাতে নিয়োজিত থাকায় এবং কৃষি জীবনধারণ পর্যায়ে (subsistence level) পরিচালিত হচেছ বিধায় উপকরণ হিসাবে কৃষি ঋণ একটি ভিন্নমাত্রার গুরুত্ব বহন করে। **সরকার** গত ২০০৩-০৪ **অর্থ** বছরে **৫০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ করেছে, যা কৃষকদের ঋণ ভার লাঘব করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রাখে। এর ফলে ১৫ লক্ষ কৃষক ৫০০ কোটি টাকা সুদ পরিশোধের দায় থেকে মুক্তি** পেয়েছে। ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরে কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৮৪১.৮৫ কোটি টাকা। কিন্তু ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪০৪৮.৪১ কোটি টাকায়। বর্তমান ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৫৫৩৭.৯১ কোটি টাকা এবং এপ্রিল'০৫ পর্যন্ত ৪২০০.০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয় যা লক্ষ্যমাত্রার ৭৫.৮৪ শতাংশ। গত ১৯৯২-৯৩ হতে ২০০৪-০৫ পর্যন্ত কৃষি ঋণ পরিস্হিতি সারণি-৭.৮ এ দেখানো হলোঃ

সারণি-৭.৮ঃ কৃষি ঋণের বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা, বিতরণ, আদায় ও স্হিতি

(কোটি টাকা)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
১৯৯২-৯৩	১৪৭৪.৪১	৮৪১.৮৫	৮৬৯.২৩	৫৬৯২.৮৪
১৯৯৩-৯৪	১৬৪৩.০৮	১১০০.৭৯	৯৭৯.১২	৬২২২.০০
১৯৯৪-৯৫	২১৬১.৭২	১৬০৫.৪৪	১১২৪.১১	৭০৪৫.২২
১৯৯৫-৯৬	২৪৩৪.২৭	১৬৩৫.৮১	১৩৪০.০২	৭৭৬৯.০৭
১৯৯৬-৯৭	২৩৯৪.২২	১৬৭২.৪৩	১৬৪৬.৩৮	৮২৫৬.০০
১৯৯৭-৯৮	২৫২৫.৮৩	১৮১৪.৫৩	১৭৭৯.২৯	৮৫১৫.০৪
১৯৯৮-৯৯	৩২৭০.০১	৩২৪৫.৩৬	২০৩৯.৬৫	৯৭০২.৫১
১৯৯৯-২০০০	৩৩৩১.০০	২৮৫১.২৯	২৯৯৬.২৯	১০৬৪৮.৯০
২০০০-০১	৩২৬৫.৯২	৩০১৯.৬৭	২৮৭৭.৮৭	১১১৩৭.২৬
২০০১-০২	৩৩২৬.৬৪	২৯৫৪.৯১	৩২৫০.২৭	১১৩৫৫.৫৮
২০০২-০৩	৩৫৬০.৫৩	৩২৭৮.৩৭	৩৫১৬.৩১	১১৯১৩.৩৫
২০০৩-০৪	৪৩৭৮.৯৪	৪০৪৮.৪১	৩১৩৫.৩২	১২৭০৫.৯৫
২০০৪-০৫	৫৫৩৭.৯১	৪২০০.০০*	১৯৪৫.৩১*	১৩৫৬৬.১৪*

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * এপ্রিল' ২০০৫ পর্যন্ত।

বক্স ৭.২ঃ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি ঋণ গ্রহীতাদের দুর্দশা লাঘব ও কৃষি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কার্যক্রম

১. ২০০৪ সালে সংঘটিত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে বন্যা-পূর্ববর্তী সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও কৃষি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত কৃষি ঋণের সকল অনাদায়ী ও আদায়যোগ্য পাওনা (খেলাপি কৃষি ঋণসহ) পরবর্তী এক বছরের জন্য পুনঃতফসিল করা এবং এ ক্ষেত্রে খেলাপী ঋণ গ্রহীতাগণ কর্তৃক down payment প্রদানের শর্ত শিথিলকরণ;

২. উল্লিখিত পুনঃতফসিলকৃত ঋণের বিপরীতে ইতোমধ্যে দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলা ও এক বছরের মধ্যে দায়েরকৃত নতুন সার্টিফিকেট মামলার কার্যক্রম এক বছরের জন্য স্থগিতকরণ;

৩. রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও কৃষি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক পরবর্তী সময়ে উপদ্রুত অঞ্চলে প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী নতুন ঋণ বিতরণের ব্যবস্থাকরণ;

৪. যে সকল ইউনিয়নে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বা রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের শাখা নেই সে সকল এলাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে কৃষি ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধিকরণ;

৫. একক ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রদেয় কৃষি ঋণের পরিমাণ যুগোপযোগীভাবে পুনঃনির্ধারণে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬. এছাড়া নতুন ঋণ সুবিধার ক্ষেত্রে কৃষকদের জন্য দ্রুততম সময়ে ঋণ সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি সকল রকম হয়রানি দূরীকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও কৃষি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ''অভিযোগ ও ঋণ তদারকি সেল'' গঠন এবং তা নিয়মিত পরিবীক্ষণ ইত্যাদি।

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

কৃষিখাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট বরাদ্দ প্রদান করা হয় ৪৯৩.১১ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি (জিওবি) বরাদ্দ ৩৩১.১৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৬১.৯৮ কোটি টাকা । জুন'০৪ পর্যন্ত সময়ে মোট ৪৪০.৯৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৮৯ শতাংশ।

চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৫৩টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ রয়েছে ৫০১.০৭ কোটি টাকা, যার মধ্যে জিওবি খাতে ৩৬০.৪৭ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৭২ শতাংশ) এবং প্রকল্প সাহায্য ১৪০.৬০ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২৮ শতাংশ)। ফেব্রুয়ারি'০৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৭১.৮২ কোটি টাকা (যা মোট বরাদ্দের ৫৪ শতাংশ)। প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় ৮৭.৩৯ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৬২ শতাংশ এবং জিওবি খাতে ১৮৪.৪৩ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৫১ শতাংশ)।

এছাড়াও চলতি অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২৩টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এই ২৩টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে সহায়তার জন্য চলতি অর্থ বছরে ১০০ কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়েছে।

মৎস্য সম্পদ

দেশে প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মৎস্য খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৪.৪ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর যা মোট জলাশয়ের প্রায় ৯১.১ শতাংশ। বাকী প্রায় ৮.৮ শতাংশ বদ্ধ জলাশয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ২১.০২ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, মাছ ও চিংড়ি এবং সামুদ্রিক মৎস্য হতে যথাক্রমে ৭.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন, ৯.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৪.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদিত হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬৩ শতাংশ আসে মাছ থেকে। বর্তমানে দৈনিক মাথাপিছু মাছ সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ২৮ গ্রাম, যেখানে প্রয়োজন কমপক্ষে ৩৫ গ্রাম। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের জিডিপিতে মৎস্যখাতে প্রবৃদ্ধির হার ৩.০৯ শতাংশ এবং দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৫.৭১ শতাংশ আসে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি থেকে। ২০০২-০৩ অর্থবছরে ৪৭,৩৭১ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ১৯৪১.৫৯ কোটি টাকা আয় হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৫৪,১৪১ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ২৩৬৩.৪৭ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদন ও মাছ চাষের উন্নত প্রযুক্তি বেসরকারি পর্যায়ে হস্তান্তরের ফলে দীঘি-পুকুর তথা বদ্ধ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। মূলতঃ দেশে এখন ব্যক্তিমালিকানাধীন খামার ও হ্যাচারি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে মোট বদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণ ৪১২৩৪১ হেক্টর। তন্মধ্যে ২৬৫৫০০ হেক্টর পুকুর, ৫৪৮৮ হেক্টর বাওড় এবং ১৪১৩৫৩ হেক্টর চিংড়ি খামার। কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদন ও মাছ চাষের উন্নত প্রযুক্তি বেসরকারি পর্যায়ে হস্তান্তরের ফলশ্রুতিতে দীঘি পুকুর তথা বদ্ধ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষে হেক্টর প্রতি বছরে ২.৫ টন মাছ এবং মাছ-চিংড়ির মিশ্র চাষে হেক্টর প্রতি বছরে ৫০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ ব্যাপক প্রসার লাভ করছে। চিংড়ির উৎপাদন ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের ৬৮,৩৪৯ মেট্রিক টন থেকে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ১,১৪,৬৬০ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলাশয়ের মোট আয়তন ১,৬৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এই জলাশয় থেকে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ২২ শতাংশ আসে। চিংড়ির চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ, হ্যাচারি স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চিংড়ি আহরণের পর চিংড়ির গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে ২০টি চিংড়ি অবতরণ কেন্দ্র ও সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ২০০৪ সালের হিসাব অনুযায়ী সরকারি পর্যায়ে ১১২টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৬৯৬টিসহ সর্বমোট ৮০৮টি মৎস্য হ্যাচারি ও খামার রয়েছে। বেসরকারি খামার ও হ্যাচারি হতে ২০০৩ সালে ৫১৭ কোটি পোনা (২৯৭.৭৮ মেঃ টন রেণু) উৎপাদিত হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছর হতে ২০০৪-০৫ অর্থবছর পর্যন্ত মৎস্য উৎপাদনের বিবরণ সারণি ৭.৯ -এ দেয়া হ'ল।

মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তি, মৎস্য সংরক্ষণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ, মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, মাছের আবাসস্থল পুণরুদ্ধার, নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচেছ। মুক্ত জলাশয় বিশেষ করে প্রকল্পের আওতায় ন্যস্ত জলমহাল এবং কুমিল্লা জেলার কয়েকটি উপজেলা বর্ষাপ্লাবিত ধানী জমিতে সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে এলাকার স্থানীয় জনগোষ্ঠির ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ

আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি খামারের সংখ্যাও দ্রুত গতিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে চিংড়ি খামারের আয়তন ৬৪০০০ হেক্টর হতে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩০৭১ হেক্টরে উন্নীত হয়েছে এবং চিংড়ি খামারের উৎপাদন ৬৮৩৪৯ মেট্রিক টন (১৯৯৫-৯৬) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ১১৪৬৬০ মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য অধিদপ্তর তথা মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ইজারাকৃত বিভিন্ন আয়তনের চিংড়ি খামার থেকে গত ৩ বছরে রাজস্ব আয় হয়েছে ৩.০০ কোটি টাকার অধিক।

সারণি ৭.৯ঃ মাছের উৎপাদন

(১৯৯৬-৯৭ - ২০০৪-০৫)

(লক্ষ মেট্রিক টন)

জলাশয়ের বিবরণ	আয়তন (লক্ষ হেঃ)	৯৬-৯৭	৯৭-৯৮	৯৮-৯৯	৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫ (প্রাক্কলন)
১। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ঃ										
(ক) মুক্ত জলাশয়										
নদী ও নদী মোহনা	১০.৩২	১.৬০	১.৫৭	১.৫১	১.৫৪	১.৫০	১.৪৪	১.৩৮	১.৩৭	১.৭২
সুন্দর বন	-	.০৯	.০৭	০.১১	০.১১	০.১২	০.১২	০.১৪	০.১৫	০.১৫
বিল	১.১৪	.৬৩	.৬৮	০.৭০	০.৭৩	০.৭৫	০.৭৬	০.৭৫	০.৭৫	০.৯১
কাপ্তাই লেক	.৬৯	.০৬	.০৬	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৯
প্লাবন ভূমি	২৮.৩৩	৩.৬২	৩.৭৮	৪.১০	৪.২৫	৪.৪৫	৪.৫০	৪.৭৫	৪.৯৮	৫.৩৫
মোট মুক্ত জলাশয়	**৪০.৪৭**	**৬.০০**	**৬.১৬**	**৬.৪৯**	**৬.৭০**	**৬.৮৯**	**৬.৮৯**	**৭.০৯**	**৭.৩২**	**৮.২২**
(খ) বদ্ধ জলাশয়										
পুকুর	২.৪২	৪.০৪	৪.৮৩	৫.০০	৫.৬১	৬.১৬	৬.৮৫	৭.৫২	৭.৯৬	৮.১৮
বাওড়	.০৫	.০৩	.০৩	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৫
চিংড়ি খামার	১.৪১	.৭৯	.৮৮	০.৯০	০.৯২	০.৯৩	১.০০	১.০১	১.১৫	১.১৭
মোট বদ্ধ জলাশয়	**৩.৮৮**	**৪.৮৬**	**৫.৭৫**	**৫.৯৪**	**৬.৫৭**	**৭.১৩**	**৭.৮৭**	**৮.৫৭**	**৯.১৫**	**৯.৪০**
মোট অভ্যন্তরীণ	**৪৪.৩৬**	**১০.৮৬**	**১১.৯১**	**১২.৪৩**	**১৩.২৮**	**১৪.০২**	**১৪.৭৫**	**১৫.৬৬**	**১৬.৪৭**	**১৭.৬২**
২। সামুদ্রিক জলাশয়ঃ										
ক) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে	.৪৮	.১৪	.১৫	০.১৬	০.১৬	০.২৪	০.৩০	০.২৮	০.৩২	০.৩০
খ) আর্টিসনাল ভিত্তিতে	ব.ন.ম*	২.৬১	২.৫৮	২.৯৪	৩.১৮	৩.৫৫	৩.৯০	৪.০৪	৪.২৩	৪.৬৬
মোট সামুদ্রিক		**২.৭৫**	**২.৭৩**	**৩.১০**	**৩.৩৪**	**৩.৭৯**	**৪.০০**	**৪.৩২**	**৪.৫৫**	**৪.৯৬**
দেশের মোট মৎস্য উৎপাদন		**১৩.৬০**	**১৪.৬৪**	**১৫.৫২**	**১৬.৬১**	**১৭.৮১**	**১৮.৯০**	**১৯.৯৮**	**২১.০২**	**২২.৫৮**

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়। * ব.ন.ম. - বর্গ নটিক্যাল মাইল।

জাটকা নিধন রোধ কার্যক্রম

দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১৫% যোগান আসে ইলিশ হতে। এ মূল্যবান সম্পদ উন্নয়নে জাটকা রক্ষা একটি অন্যতম কার্যক্রম। ইলিশ সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনায় বর্তমান সরকার বিভিন্ন সংস্থা যথা- প্রশাসন, নৌবাহিনী, কোষ্টগার্ড, আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনী, মৎস্য অধিদপ্তরসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সমভিব্যহারে একটি সমন্বয় কমিটি গঠনপূর্বক সমন্বিত উদ্যোগে জাটকা রক্ষা অভিযান পরিচালনা করছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে জাটকা রক্ষাকল্পে ১.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে নভেম্বর'০৩ থেকে মে'০৪ পর্যন্ত সময়ে ১৬৫৫টি অভিযানের মাধ্যমে প্রায় ৮২.৯২ কোটি টাকার সমমূল্যে ১.২২ কোটি মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল আটক, প্রায় ৩৪৮ মেট্রিক টন জাটকা আটক এবং ১১৫টি মামলা দায়ের করা হয়। গৃহীত ব্যবস্থার ফলে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ইলিশ উৎপাদন ২.০০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে জাটকা নিধন রোধে রাজস্ব বাজেট হতে ১.৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের ৩ বছর মেয়াদি ১০ কোটি টাকার পুনর্বাসন কর্মসূচির মধ্যে চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

বন্যা-পরবর্তী মৎস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম

২০০৪ সালে সংঘটিত ভয়াবহ বন্যা এবং অতি বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হওয়ার সাথে সাথে মৎস্য অধিদপ্তর সদর দপ্তর, বিভাগ, জেলা/উপজেলা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপনের মাধ্যমে বন্যায় মৎস্য সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ শুরু করে। নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থার ফলে মৎস্য সেক্টরের ক্ষয়ক্ষতি প্রতিবেদন যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা সম্ভব হয়। মৎস্য সেক্টরে মৎস্য পুনর্বাসন বাবদ বর্তমান সরকার ১০.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মৎস্যপক্ষ'০৪-এর আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করে ২.৬০ কোটি টাকা বন্যা পুনর্বাসন কাজে মাঠ পর্যায়ে প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র হ্যাচারি/ নার্সারি মালিকদের মাঝে পোনা বিতরণ করা হয়েছে। অধিকন্তু ঋণ প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য ঋণ সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

মৎস্যখাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

২০০৪-০৫ অর্থবছরে এডিপিতে ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্প (১১টি বিনিয়োগ ও ৫টি কারিগরি) প্রকল্পের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ১২৪.৯৮ কোটি টাকা (৩৮.৮১ কোটি টাকা স্থানীয় মুদ্রা এবং ৮৬.১৭ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে মার্চ'০৫ পর্যন্ত মোট ৬৬.২৩ কোটি টাকা ব্যয় (১৮.১২ কোটি টাকা স্থানীয় মুদ্রা এবং ৪৮.১২ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য) হয়েছে অর্থাৎ মোট বরাদ্দের প্রায় ৫৩ শতাংশ ব্যয় হয়েছে।

পশু সম্পদ

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য নিরসনে পশুসম্পদ খাত বর্তমানে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচিত। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পশুজাত দ্রব্য, যেমন- চামড়া, পশম ও হাড় ইত্যাদির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদে (জিডিপি) এ খাতের অবদান ২.৯১ শতাংশ যা কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ১৬.১৯ শতাংশ। এ সময়ে এই উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৪.৯৮ শতাংশ। যান্ত্রিক চাষাবাদের পাশাপাশি দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ ভূমিকর্ষণ কায়িকভাবে করা হয়ে থাকে। দেশে শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ জনগোষ্ঠী সরাসরি ও শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ আংশিকভাবে পশু সম্পদের উপর নির্ভরশীল। বেসরকারিখাত ও এনজিওসমূহকে সম্পৃক্ত করার ফলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ খাত পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ১৯৯১-৯২ অর্থছরে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪.১৯ কোটি ও ১১.০৫ কোটি। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪.৩৪৫ কোটি ও ২০.৯ কোটি। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এ সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪.৪৪ কোটি ও ২২ কোটি। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে হাঁস-মুরগির মোট ডিমের উৎপাদন ছিল ৩ শত ৭৯ কোটি এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ শত ১৬ কোটি। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে দুধ এবং মাংসের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১৩.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৪.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০.৩ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৯.৬ লক্ষ মেট্রিক টন।

সরকার পশু সম্পদ উন্নয়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে ব্যাপক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করছে। ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন-জাতীয় কর্মসূচিসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর বাণিজিক খামার স্থাপন এ খাতে যেমন ব্যাপক অবদান রেখেছে তেমনি বেকার যুবকদের আত্ম কর্ম সংস্থান ও বিরাট অঙ্কের বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছে। ইতোমধ্যে সরকার দুগ্ধ খামারিদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে খামার রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ৫ কোটি টাকা ৪৭৭৫টি খামারের মাঝে ইনসেনটিভ প্রদান করেছে। প্রতিটি গরুর জন্য ৫০০০ টাকা করে দেয়া এই ইনসেনটিভ মানুষকে দুগ্ধ খামার স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছে ফলে দুগ্ধ খামারিদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পশু পাখির রোগ প্রতিরোধক টিকা প্রদান

সরকার এসমস্ত বাণিজ্যিক গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করার নিমিত্তে দীর্ঘদিন যাবৎ ১০ প্রকারের টিকা উৎপাদন করে আসছে। ২০০৪-০৫ (ডিসেম্বর, ০৪) পর্যন্ত ৮.৯৬ কোটি ডোজ টিকাবীজ উৎপাদন এবং বিতরণ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে ছাগলের পিপিআর রোগের টিকাবীজ দেশে উৎপাদিত না হওয়ায় স্বল্প সংখ্যক টিকাবীজ আমদানি করে রোগ

প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত টিকাবীজের অভাবে পিপিআর রোগে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাগল মারা যায়। বর্তমান সরকার বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে জানুয়ারি'০২ হতে পিপিআর রোগের টিকা বীজ উৎপাদন শুরু করে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ১৭২.৮ লক্ষ ডোজ টিকাবীজ উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে (ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত) ৬৬.৭৫ লক্ষ ডোজ টিকাবীজ মওজুদ আছে।

পশু পাখির সুষম খাদ্য সরবরাহ

পশুসম্পদ উৎপাদন উন্নয়নে প্রধান শর্ত হচ্ছে পর্যাপ্ত সুষম খাদ্য সরবরাহ করা। দেশে বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে ৪৩টি ফিড মিল পোল্ট্রির সুষম খাদ্য সরবরাহে ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকার গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খাদ্য ঘাটতি পূরণে বিদেশ থেকে বিনা শুল্কে পশু খাদ্য আমদানির সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া দেশে পশু খাদ্য হিসাবে ভূট্টা চাষ ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

ছাগল পালন কর্মসূচি - একটি বিশেষ উদ্যোগ

দেশের ব্লাক বেঙ্গল ছাগল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিসম্পদ। ছাগল উৎপদান বৃদ্ধির ফলে অতি দরিদ্র ও দরিদ্রশ্রেণীর লোকজনের দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে **"ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন-জাতীয় কর্মসূচি"** গৃহীত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৭ এপ্রিল ২০০২ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। প্রাথমিকভাবে জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০০৮ পর্যন্ত রাজস্ব বাজেটের আওতায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। এর আওতায় বিভিন্ন সহায়ক প্রযুক্তি এবং উপযোগ সরবরাহ করে দেশের ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৬৪টি জেলায় নির্বাচিত ৪০০টি উপজেলায় ২৬৪০০ জন সুফলভোগীর মধ্যে প্রতি উপজেলায় ৩.৭৫ লক্ষ টাকা করে মোট ১৫ কোটি টাকা ছাগল ক্রয়ের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত সুফলভোগীগণ প্রাপ্ত টাকা থেকে মোট ১০৮০০০টি ছাগল ক্রয় করেছে। খামারের সুফলভোগীরা কৃমিনাশক ঔষধ ও টিকা ইত্যাদি উপযোগ বিনামূল্যে পাবেন। এছাড়া টিকা ও কৃমিনাশক ঔষধ ব্যবহার, খাদ্য যোগানের জন্য ঘাস উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বন্যা পুনর্বাসন কর্মসূচি

পশুসম্পদ পুনর্বাসন কর্মসূচিতে হাঁস-মুরগি, ছাগল বিতরণ, বকনা বিতরণ, জরুরি ঔষধ, টিকা, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্য, ঘাসের বীজ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির শেড এবং অধিদপ্তরের অবকাঠামো মেরামত কার্যক্রমের জন্য চলতি অর্থ বছরে ১০৩ কোটি ৭১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা প্রাক্কলনের ভিত্তিতে পশুসম্পদ পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। এ পর্যন্ত পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির দানাদার খাদ্য, হাঁস-মুরগি বিতরণ, জরুরি ঔষধ, টিকা উৎপাদন সামর্থ বৃদ্ধি, ঘাসের বীজ ও পশুসম্পদ অধিদপ্তরের অবকাঠামো মেরামতের জন্য ১২ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। ১লা সেপ্টেম্বর ২০০৪ থেকে দেশের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে বন্যা পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু হয়েছে।

২০০৪-০৫ অর্থবছরে পশুসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ৮টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৫৯.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে; এর মধ্যে ৫৩.৯২ কোটি টাকা স্থানীয় মুদ্রা এবং ৫.৬০ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য রয়েছে। ফেব্রুয়ারি'০৫ পর্যন্ত মোট ২৪.১৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৪১ শতাংশ।